ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 539-547
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.041

বাংলার পীরসংস্কৃতি ও পীরসাহিত্য : একটি নিরীক্ষা

ড. সুদীপ্ত চৌধুরী, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, খড়গপুর কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 09.01.2025; Accepted: 24.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The influence of Sufism in medieval Indian history is a significant cultural phenomenon, with its reach extending to various regions, including Bengal. In Bengal, Sufi traditions merged with local folk practices, giving rise to Peer culture or Peerism. This unique cultural synthesis resonated deeply within the folk society, leading to the development of an independent body of Peer literature, which incorporated elements of folk traditions.

One of the most notable examples of this literary tradition is the Pala of Banabibi. This popular Peer-poem occupies a special place in Bengal's cultural landscape, blending religious, social, and ecological themes into a cohesive narrative. By utilizing Stith Thompson's Motif-Index of Folk-Literature as an analytical tool, this article seeks to explore the recurring motifs within the Pala of Banabibi. The aim is to understand the cultural significance of Peer literature and demonstrate how the motif-index method can offer insights into the narrative structures and thematic concerns of such texts.

This study not only highlights the integration of Sufi culture into Bengal's folk traditions but also sheds light on how these influences created a distinctive literary tradition that continues to hold cultural relevance.

Keywords: Middle Ages, Culture, Sufism, Peerism, Folklore and Folk literature, Motif Index.

বাংলা শব্দভাণ্ডারে 'পীর' শব্দটি একটি কৃতঋণ শব্দ হিসেবে গৃহীত, যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'বৃদ্ধ'। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এই শব্দটির উৎস ফারসি 'পীর্' বলে জানিয়েছেন; যার অর্থ 'মুসলমান সিদ্ধ পুরুষ'। ইসলামের সুফি মতবাদ থেকে এই পীরবাদের উদ্ভব। সেখানে 'পীর' অর্থে এই বিশেষ অধ্যাত্ম সাধনার পরম গুরুকে বোঝানো হয়ে থাকে। এদের উদ্ভবের আদি ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বঙ্গে স্বূফী প্রভাব'-এ জানিয়েছেন -

> 'প্রাচ্য ভূখণ্ডের,- বিশেষতঃ বোখারা, সমরকন্দ, তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান ও প্রাচ্য পারস্যের বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগী মুসলমানদের মধ্যে কালক্রমে বৌদ্ধ-হিন্দু মানসিকতা ক্রিয়াশীল হইয়া উঠার ফলে, প্রাচীন স্বূফী-মতবাদের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে "পীর"-বাদ জন্মলাভ করে। ঐতিহাসিক ও ইতিহাস-অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন, এই দেশগুলি যে শুধু কণিষ্কের (সিংহাসনারোহণ-কাল ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) সময় হইতে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ তথা হিন্দু সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তাহা নহে, মুসলমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত ইহারা বৌদ্ধপ্রভাবে ভরপুর এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল...
>
> ... "পীর"-বাদ প্রধানতঃ পারস্য-পূর্ব্ববর্তী বিশাল ভূখণ্ডের ইসলামিক খিচুড়ী। এই খিচুড়ী পাকাইবার ব্যাপারে তুর্কি তাজিক্, আফগানী, ফারসি প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগী মুসলমানগণ প্রধানতঃ পাচকের কাজ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই খিচুড়ীতে যে বৌদ্ধ মাল-মসলাই অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? তাই দেখিতে পাই ফারসি "পীর" শব্দটি পর্য্যন্ত "থের" (সং= স্থবীর) শব্দের হুবহু অনুসরণ মাত্র; উভয় শব্দ সমভাবে "বৃদ্ধ ব্যক্তি" এই অর্থ জ্ঞাপন করে। বৌদ্ধদের "চৈত্য পূজা" প্রথা, অর্থাৎ "থের" সমাধি পূজার প্রথা, "পীর" দিগের কবর-সেবা করিবার প্রথা প্রবর্তিত করার মূলে ক্রিয়া করায়, বৌদ্ধধর্ম্মত্যাগী খ্রীষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রাচ্য মুসলমানদিগকে যে "পীর"-বাদের সর্ব্বতোমুখী বিকাশে সাহায্য করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।"[১]

বঙ্গদেশের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাই খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক গৌড়-লক্ষণাবতী অধিকারের পূর্ব থেকেই কিন্তু বঙ্গদেশের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের সুফি সংস্কৃতির যে যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল তার নেপথ্যের কারণ ছিল বাণিজ্য। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকেই আরবের সঙ্গে বঙ্গদেশের নৌ-বাণিজ্যের সম্পর্কের সূত্রপাত। মূলত চট্টগ্রাম বন্দর এই সময় থেকেই আরব বণিক অধ্যুষিত হয়ে উঠতে থাকে। এই বণিকদের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু সুফি সাধকরা ধর্ম প্রচারের স্বার্থে এখানে আসতে থাকেন এবং দেখা যায় যে মোটামুটি খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে চট্টগ্রামে ইসলাম ধর্ম এদের মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করেছে। অতঃপর ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি বিজয়ের পর রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে পড়তে থাকে এমনকী রাজশক্তির প্রতিভূ হয়ে উঠতে থাকে। অধ্যাপক সনৎকুমার নস্কর এ প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন –

> রাজনৈতিক অধিকার পাকা হওয়ার পর বোধহয় এবার আহূত হলেন পীর দরবেশ, আউলিয়া প্রমুখ ধর্ম প্রচারকের দল। তারা কখনো তর্কাতীত কেরামতীর দ্বারা, কখনো জ্ঞানগর্ভ প্রবচনের দ্বারা কিংবা অনারম্বর জীবনযাত্রার দ্বারা প্রভাবিত করতে চাইলেন হিন্দু জনচিত্তকে। কোনরকম ব্যবহারিক জ্ঞান শিক্ষা নয়, সম্পূর্ণ ধর্মীয় শিক্ষাদান ছিল এদের প্রধান উদ্দেশ্য। আর তার ফলেই বাংলার বিভিন্ন শহরে ও গ্রামাঞ্চলে সূফীরা দরগা ও তাকিয়া নির্মাণ করে বিনা রক্তপাতে জয় করে নিচ্ছিলেন এর বিশাল ভূখণ্ড আর মানবহৃদয়। অবশ্য কোথাও কোথাও ধর্মীয় উন্মাদনা প্রকাশের জন্য মঠ-মন্দির ধ্বংস করা হচ্ছিল।[২]

বাংলায় যে-সব সুফি খানদানের প্রভাব সর্বাত্মকভাবে পড়েছিল সেগুলি হল:

১. **সুহরবরদীয়হ্ খানদান** - ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম এই খানদানেরই সাধকগণ বিস্তার লাভ করেছিল। এই সম্প্রদায়ের আদি গুরু বলে বিবেচিত হন মুলতানের শেখ বাহারউদ্দিন ধকারিয়া মুলতানি। বাংলায় এই খানদানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাধন ছিলেন শ্রীহট্টের শাহজালাল্ মুজররদ্-ই-য়মনী। শ্রীহট্ট-পশ্চিম আসাম অঞ্চলে তার প্রভাব ব্যাপক হয়ে ওঠে।

২. **চিশতীয়হ্ খানদান** - চিশতিয়া সম্প্রদায়ের ভারতীয় আদি গুরু হলেন আজমীরের খাজা মইনুদ্দিন চিশতী। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে বিশেষত চট্টগ্রাম ও ফরিদপুর অঞ্চলে এই খানদানের বিশেষ প্রভাব ছিল। এই খানদানের অন্যতম সুফি সাধক নুরুদ্দিন কুতুব-ই-আলম ছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর হিন্দু রাজা গণেশের বিপক্ষের মূল চক্রান্তকারী।

৩. **কলন্দরীয়হ্ খানদান** - এই সম্প্রদায়কে চিশতীয়হ্ খানদানেরই শাখা বলে মনে করা হয়। বাংলায় এই মতের আদি গুরু হলেন পাণ্ডুয়ার সাহ শফিউদ্দিন শাহী। ষোড়শ শতকে রচিত মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে এই সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে। পাশাপাশি এই সময়েই আরবি হরফে লেখা 'যোগ কলন্দর' পুথি পাওয়া গেছে চট্টগ্রামে।[৩]

৪. **মদারীয়হ্** - পূর্ব বাংলার পাবনা, ফরিদপুর এবং ভারতের ত্রিপুরা জেলাতে এদের প্রভাব ছিল। এই সম্প্রদায়ের সাধনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা যাদুবিদ্যা ও অলৌকিক কর্মকাণ্ড।

৫. **অস্থমীয়হ্** - এই সম্প্রদায় ভারতে খিদ্ববীরহ্ নামে পরিচিত! মুহাম্মদ ইনামুল হক এদের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন "বাঙ্গালী মুসলমানদের নিকট "খিদ্বর্" প্রধানত হিন্দু জল দেবতা "বরুণেরই" প্রতিনিধি রূপে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালার বিখ্যাত বিখ্যাত নদীতটবাসী মুসলমানগণ এখনও অনেক স্থানে "খিদ্বর্" প্রীতি মানসে প্রতি বৎসর "বেরা ভাসান'' উৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকেন। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও এই "বেরা ভাসান'' উৎসব বাংলাদেশে প্রবল ছিল.."[৪]

৬. **নক্কশ্‌বন্দিয়হ্ খানদান** - বাংলার মঙ্গলকোট, রাজশাহী ইত্যাদি অঞ্চলে এদের প্রভাব ছিল। বাংলায় ইমতের প্রবক্তা শেখ হামিদ দানিশমন্দ। এরা তাদের সাধনাকে হিন্দু যোগ চর্চার খুব কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিলেন। তন্ত্রের কুলকুন্ডলীন শক্তি এদের পরিভাষায় পরিণত হয় 'লতিফা'-য়।

৭.**কাদিরীয়হ্ খানদান**- এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল কাদের জিলানী। এই সম্প্রদায়ভুক্ত সুফি সাধকরাই সর্বশেষে বাংলায় প্রবেশ করেন। মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি সৈয়দ আলাওল ছিলেন এই সম্প্রদায়ভুক্ত।

এই সাতটি সুফি সম্প্রদায়ের উপরে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সংস্কৃতিরই এক মিশ্র প্রভাব পড়েছিল। আর সেই মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব যে কতখানি সুদূরপ্রসারী হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন সুফি পুথিগুলিতে। সৈয়দ সুলতানের লেখা *'জ্ঞানচৌতিশা'* অথবা *'জ্ঞানপ্রদীপ'*, শেখ চান্দের লেখা *'হরগৌরী সম্বাদ'* এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এখানে তাত্ত্বিকভাবে শিব ও শক্তির যুগন্থলীলাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যায়। এবং হিন্দু দর্শনের পাশাপাশি এখানে বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব লক্ষণীয়। পাশাপাশি উল্লেখ্য হাজী মুহাম্মদের 'সুরতনামা', মোহাম্মদ শরিফের *'নূরনামা'* গ্রন্থের প্রসঙ্গ। আবার আলী রাজার রচিত *'জ্ঞানসাগর'* নামক পুস্তকে মুসলিম মরমীয়াবাদের উপর সরাসরি তন্ত্রের প্রভাব পড়েছে। তিনি আবার রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বেশ কিছু পদেরও রচয়িতা। বাংলা সুফি তত্ত্বে, তান্ত্রিক পদ্ধতির যে

প্রভাব পড়েছিল, তার ফলে কায়াসাধনার একটা বিকল্প রূপ পরিগৃহীত হয়েছিল এর অন্তর কাঠামোয়। বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে আহমেদ শরীফ বলেছেন -

> প্রথমে দেহের সাধন- মূলাধার থেকে শক্তির (অনলের) ঊর্ধায়ন লতিফা তথা জ্যোতির উন্মেষ সাধন। দ্বিতীয় স্তরে মণিপুরে তথা নাভি দেশে বায়ুর নিয়ন্ত্রণ ও নাসিকা লক্ষ্যে ধ্যান। এই স্তরে আত্মার দর্শন ঘটে। তৃতীয় স্তরে, কলিজা-স্থিত অমৃতরূপ জলকুণ্ডে শশী দর্শন। এখানে আত্মা ও নূর-মুহাম্মদের মিলন। নুর মুহাম্মদ পরমাত্মার প্রতীক। চতুর্থ স্থানে দেহস্ত সহস্রদল পদ্মের উপর জ্যোতির্ময় আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। এভাবে ঘটের মধ্যে চিনে নিতে হয় 'প্রভু নিরঞ্জন'।[৫]

পরবর্তীকালে সুফি সংস্কৃতির এই মিশ্র প্রভাব থেকেই বাংলার লোকায়তস্তরে আত্মপ্রকাশ লাভ করে 'পীর সংস্কৃতি'। আর তা থেকে তৈরি হয় পীরকেন্দ্রিক বিভিন্ন সংস্কার, যেমন -

১. জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভক্ত পীরের দরগাহ্ অর্থাৎ সমাধিস্থানে বা নজবগাহে অর্থাৎ কল্পিত দরগায় মানত ও শিরনি প্রদান করেন।
২. মুসলমান ভক্তগণ পীরের আত্মার শান্তি কামনা করে জিয়াবত করেন। অন্যদিকে হিন্দু ভক্তগণ পীরের প্রতি ভক্তি নিবেদন করতে নানাবিধ অর্ঘ্য প্রদান করেন।
৩. মুসলিম আদর্শে দরগায় কুরআন পাঠ হয় কিন্তু নামাজ অনুষ্ঠান হয় না। হিন্দু আদর্শে লুট প্রদত্ত হয়।
৪. সন্তান কামনায় বা রোগ নিরাময় জন্য অথবা অন্য কোন কামনার পরিপূরণার্থে দরগায় ইট বাঁধা হয়।
৫. পীরগণের জন্ম বা মৃত্যুবার্ষিকীতে হিন্দু মুসলিম সেবায়েত ও জনসাধারণ দরগায় সম্বৎসর মেলা অনুষ্ঠান উদযাপন করেন।
৬. হিন্দু মুসলিম ভক্তগণ পীরের নানা অলৌকিক কীর্তি কথা প্রচারমূলক কাহিনী বিশ্বাস করেন এবং তা প্রচারও করে থাকেন। মূলত এইখান থেকেই পীর সাহিত্যের উদ্ভব।

আরো ভালো করে বলতে গেলে মধ্যযুগের দ্বিতীয় অর্থ থেকে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে এইসব পীর-পীরানীদের (পীরানী = মহিলা পীর) অলৌকিক কীর্তিকলাপূর্ণ আখ্যান নির্ভর যে সাহিত্য শাখার বিকাশ ঘটতে থাকে, তাকেই সামগ্রিক অর্থে বাংলা *'পীর সাহিত্য'* বলে অভিহিত করা হয়েছে। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে দেখতে গেলে এগুলি বেশিরভাগই কিংবদন্তি বা Legend-এর সমতুল্য।[৬] জার্মানিতে এই ধরনের কাহিনীকে বলা হয় 'Sage' এবং ইংরাজিতে একে Local Tradition-ও বলা হয়ে থাকে। 'লিজেন্ড' শব্দটির মাধ্যমে আদিতে কোনো ভোজ বা উৎসবে কোনো সন্ন্যাসী বা ধর্মগুরুর জীবন-আখ্যান শ্রদ্ধা করে গীত বা কথিত হওয়াকে বোঝাতো। কিন্তু পরবর্তীকালে এর অর্থ বিস্তৃতি প্রাপ্ত হয়েছে। নানা প্রকার সংস্কার, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, ঐতিহাসিক নানা ঘটনা বা ব্যক্তিত্ব ও স্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এগুলি এক চিত্তাকর্ষক আখ্যানে পরিণত হয়েছে। কাহিনী যতই অলৌকিক হোক না কেন, কিংবা সেখানে অযৌক্তিক তথ্য থাকুক না কেন, এর প্রতি সংশ্লিষ্ট সমাজের সর্বজনীন বিশ্বাস ও চিরন্তন শ্রদ্ধা, প্রজন্ম পরম্পরায় বাহিত হয়ে থাকে। Sitth Thompson এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন –

> This form of tale purports to be an account of an extraordinary happening believed to have actually occurred. It may recount a legend of something which happened in ancient times at a particular place.[৭]

বিশিষ্ট গবেষক গিরীন্দ্রনাথ দাস বাংলার পীর সাহিত্যকে তার প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মোট চারটি বিভাগে ভাগ করেছেন;[৮] যথা -

১. **পীর লোককথা** - আল্লাহর শক্তিতে বলিয়ান হয়ে বিভিন্ন পীরের নামে অসংখ্য যেসব অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রচারমূলক কিংবদন্তিকে কেন্দ্র করে যেসব সংক্ষিপ্ত মৌখিক কাহিনী প্রচলিত আছে; এগুলি তারই নিদর্শন।

২. **পীর জীবনী** - বিভিন্ন ঐতিহাসিক পীরদের বংশ পরিচয় জীবনী এবং অন্যান্য অলৌকিক কিংবদন্তিমূলক কর্মকাণ্ডের সংকলন। এগুলি সাধারণত গদ্যতে রচিত।

৩. **পীর নাটক** - নারী-পুরুষের প্রণয় অথবা দুইটি পরস্পর বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব দিয়ে নাট্যরস সৃষ্টিকারী আঞ্চলিক পালাগানমূলক রচনা এটি। এর মধ্যে দিয়ে আসলে পীর বা প্রাণীর মাহাত্ম্য কথাই বিবৃত করা হয়।

৪. **পীর কাব্য** – খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক অথবা কাল্পনিক পীর চরিত্রকে কেন্দ্র করে পীরকাব্য রচিত হতে শুরু করে। এদের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল-

ক) ঐতিহাসিক পীর - ইসমাইল গাজী, মসলন্দী, শাহ সুফি সুলতান, সুলতান বলখি, শেখ ফরিদ, মনসুর হাল্লাজ, পীর একদিল শাহ, পীর গোরাচাঁদ প্রমুখ।

খ) কাল্পনিক পীর তথা ছদ্ম পীর - সত্যপীর, মানিকপীর, গাজী সাহেব, কালু পীর, বনবিবি, ওলা বিবি প্রমুখ।

এদের মাহাত্ম্য বিষয়ক যে প্রচারমূলক গাথা কাব্যগুলি পাওয়া গিয়েছে তার প্রধান আদলটি রচিত হয়েছিল বাংলা মঙ্গলকাব্যকে কেন্দ্র করে। পাশাপাশি মঙ্গলকাব্য পাঠে ও শ্রবণে মানুষের কল্যাণ হয়, সেই সমান বিশ্বাসই, এই পীর গাথাগুলির রচনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। কাহিনী যতই অলৌকিক বা অযৌক্তিক হোক না কেন, তার মূল আবেদন ছিল এক বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষের ভক্তির কাছে। আর তাই এইসব কাব্যগুলির মধ্যে দিয়ে সেই গোষ্ঠীচেতনারই চূড়ান্ত প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করে থাকি। তবে এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে, এই ধরনের কাব্যগুলির মাধ্যমে পীরদের মাহাত্ম্য প্রচার করা হলেও সেই মাহাত্ম্যের নেপথ্যের ইসলাম আদর্শকেই প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এই শ্রেণীর কাব্যের একটা প্রধান তফাৎ হল; মঙ্গলকাব্যে অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবী চেয়েছেন নিজেদের মাহাত্ম্য প্রচার করতে। কিন্তু এইসব পীরগণ চেয়েছেন নিজেদের পরিবর্তে আল্লাহর প্রচার। আসলে এই গাথাকাব্যগুলিতে মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিকটাই গ্রহণ করা হয়েছে, তার মেজাজটাকে নয়। যেহেতু মঙ্গলকাব্য ছিল মধ্যযুগের অত্যন্ত একটি জনপ্রিয় মাধ্যম, সেই জন্যেই সেই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে এবং মিশ্র জনজাতির মধ্যে এই নতুন ধরনের কাব্যকে ছড়িয়ে দেওয়ার অভীপ্সা থেকেই মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিককে ব্যবহার করা হয়েছিল বলে মনে হয়। আসল ঝোঁকটা ছিল মাহাত্ম্য প্রচারের দিকে। তাই দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই কাহিনীর পরম্পরা

সেভাবে রক্ষা করার প্রয়াস নেই। অথবা অন্য পীরকে কেন্দ্র করে রচিত কাব্যের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে উঠতে দেখি। বিশিষ্ট গবেষক সা'আদুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেছেন –

> পীরগাথা বিশ্লেষণে আরো দেখা যায়- একজন পীরের কীর্তিকলাপ অন্য পীরের মাহাত্ম্য কাহিনীতে অবলীলায় মিলে গেছে। পীর গোরাচাঁদ (আব্বাস উদ্দিন রহঃ) নরবলি গ্রহণের জন্য আকানন্দ-বাকানন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, 'রায়মঙ্গল' কাব্যে দক্ষিণরায়ের নরবলির বিরুদ্ধে বড় খাঁ, বনবিবি ও শাহ-জঙ্গলি ('বনবিবির জহুরনামা) যুদ্ধ করেছিলেন—তা সত্যপীর কাহিনীর 'মালঞ্চা পালা'তে সঞ্চারিত হয়েছে। এইভাবে ছদ্ম ঐতিহাসিক, ঐতিহাসিক উভয় শ্রেণীর পীর গাথার মধ্যে পীরদের মাহাত্ম্য-কাহিনী বাংলার লোকমানস দ্বারা পরিশ্রুত হয়ে এক বিমিশ্র ও অখণ্ড পীর সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে।
>
> তাই পীরগাথাগুলির মধ্যে সংশ্লিষ্ট গাজী বা দরবেশদের ব্যক্তি জীবনের ঐতিহাসিকতা মুখ্য নয় বরং লোকমনের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়-চেতনাজাত সমাজবোধের ঐতিহাসিকতাই এখানে প্রধান।[৯]

বোঝাই যাচ্ছে যে, এখানে সমাজ বলতে এক বিশেষ গোষ্ঠীবদ্ধ কৌম সমাজকেই বোঝানো হয়েছে। যার সাংস্কৃতিক ইতিহাসচেতনার বিশেষ অভিমুখটির সঙ্গে সেই সমাজের বিশ্বাস-সংস্কার, প্রথা-পার্বণের দিকগুলিও পরস্পর সম্পৃক্ত। সুতরাং পীরসংস্কৃতি ও সাহিত্যের মধ্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যতটা না পাথুরে প্রমাণ খতিয়ে দেখা প্রয়োজন, তার চেয়েও বেশি Stith Thompson প্রবর্তিত 'মোটিফ ইনডেক্স'[১০]-এর প্রয়োগ করা দরকার বলে মনে হয়। আর তাহলেই আমরা এই কাহিনীগুলির মধ্যে থাকা আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক বর্ণনাগুলির সঠিক ব্যাখ্যা যেমন পেতে পারি, তেমনিভাবেই মোটিফ ইনডেক্সে এদের চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে এদের বিশ্বজনীনতা/ আন্তর্জাতিকতা বুঝতে সক্ষম হতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ জনপ্রিয় বাংলা পীরসাহিত্যগুলির মধ্যে বনবিবির পালা থেকে প্রাপ্ত নির্বাচিত কিছু অংশের মোটিফ বিশ্লেষণ করে আমরা এই পর্যালোচনার ইতি টানব। বনবিবির এই পালা 'জহুরানামা' নামে পরিচিত। এর তিনটি ভাগ, ক) জন্মখণ্ড, খ) নারায়ণী জঙ্গ এবং গ) দুখে যাত্রা। আরবি 'জহুরা' শব্দের অর্থ কৃতিত্ব বা অলৌকিক শক্তি, আর ফারসি 'নামহ্' শব্দের অর্থ হল পুথি বা পুস্তক। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই এই 'জহুরানামা'য় মূলত বনবিবির আবির্ভাব ও তাঁর বিভিন্ন অলৌকিক কর্মকাণ্ড প্রচারিত হয়ে থাকে। অরণ্যানী এই লোকায়ত দেবীর আরাধনায় খুব সঙ্গতভাবেই বৈদিক মন্ত্রের বা আচারের প্রভাব চোখে পড়ে না। বরং হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর মানুষের কাছে পূজিত হওয়ার কারণে এখানে এক মিশ্র সংস্কৃতিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু প্রধান অঞ্চলে এই বনবিবির বর্ণ হরিদ্রা, মাথায় মুকুট, গলায় হার ও বনফুলের মালা। সর্ব অঙ্গ নানা রকম অলংকারে ভূষিত। কোলে থাকে তার একটি শিশু। কোন কোন স্থানে আবার শিশু থাকে না। তবে এই দেবী ব্যাঘ্র বাহনা। অন্যদিকে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে এই দেবীর আদল তৈরি করা হয় মুসলমান ঘরের কিশোরী বালিকার ন্যায়। পরনে থাকে পিরান বা ঘাগড়া পাজামা, মাথায় থাকে টুপি, চুল-বিনুনি করা, গলায় নানারকম হার ও বনফুলের মালা। পায়ে জুতো মোজা ও পাতলা ওড়না ব্যবহার করা হয় প্রসাধনে। কোন কোন স্থানে দেবীর হাতে থাকে 'আশাবাড়ি' বা দন্ড এবং ঝান্ডা। বাহন কোথাও বাঘ, আবার কোথাও মুরগি। কোন কোন স্থানে বনবিবির কোলে একটি বালক মূর্তিও দেখা যায়।[১১] 'বনবিবির পালা'-র কাহিনীতে প্রথমেই আমরা যেসব মোটিফ দেখতে পাই তা হল, ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণরায় (মোটিফ - এ ১৩২.১০ ব্যাঘ্র দেবতা), ও বনবিবি (মোটিফ – এ ২৮৯.১ বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা), এছাড়াও কথাবলা বাঘ (মোটিফ – বি২১১.২.২.১)। এর পাশাপাশি আর যেসব মোটিফ বনবিবির পালায় দেখতে পাওয়া যায় তা

হল, সৃষ্টিকর্তা বিধাতার (মোটিফ – এ০ সৃষ্টি কর্তা) কাছে ইব্রাহিম ও তার প্রথম স্ত্রী ফুলবিবি সন্তান কামনায় বহু প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাদের সন্তান হয় না অবশেষে বিধাতার ভবিষ্যৎবাণী হয় (মোটিফ - এম ৩১১.০.৩ ভবিষ্যৎবাণী: সন্তানের জন্ম হবে) যে সন্তানের জন্য ইব্রাহিমকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে হবে। সেই মতো ইব্রাহিম গোলাবিবি বা গুলালকে বিবাহ করেন। কিন্তু ফুল বিবি এই বিবাহে মত দিয়েছিলেন একটি শর্তের পরিবর্তে। গুলাল যখন দশমাসের গর্ভবতী তখন ফুলবিবি ইব্রাহিমকে সেই শর্তের কথা মনে করিয়ে দিয়ে জানান যে, গুলালকে এই অবস্থাতে বনবাস পাঠাতে হবে। ইব্রাহিমকে বাধ্য হয়ে তাই করতে হয়। এমতাবস্থায় বনের মধ্যে একাকী নিয়ে গুলাল কাঁদতে কাঁদতে অচেতন হয়ে পড়লে, পরমেশ্বরের মেহেরবানী হয়। তিনি বেহেস্ত থেকে চারজন নারীকে দেখাশোনার জন্য প্রেরণ করেন (মোটিফ : এ ১৬৫ ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত দূত)। অতঃপর গুলাল নির্বিঘ্নে যমজ সন্তানের জন্ম দিলে (মোটিফ: জেড ৭১.০.২ সংকেত সংখ্যা ২) সেই নারীরা অদৃশ্য হয়ে যায় (মোটিফ: ডি ১৮৮০ অদৃশ্য হওয়া)। এই যমজ সন্তান হল বনবিবি ও তাঁর ভাই শাহ্‌জঙ্গলী (মোটিফ: পি ২৫৩ একভাই ও একবোন)। এরপর গুলাল বনমধ্যে বনবিবিকে ফেলে রেখে শাহ্‌জঙ্গলীকে নিয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ করে। বনবিবিকে বড়ো করে তুলতে থাকে জঙ্গলের পশুপাখি (মোটিফ: এস ৩৫২.১ পরিত্যক্ত শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করে পশু এবং মোটিফ: এস ৩৫২.২ পরিত্যক্ত শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করে পাখি)। বনবিবিকে দুধ পান করায় হরিণ (মোটিফ: বি৪৪৩.১ উপকারী হরিণ)। অতঃপর সাত বছর পরে ইব্রাহিম ফিরে এসে (মোটিফ: জেড ৭১.৫.০.১ সংকেত সংখ্যা ৭) ভাইবোনকে ফিরিয়ে নিয়েছে যাওয়ার কথা বললে, বনবিবি রাজি হন না। বরং আল্লাহ্ যে তাদের আঠারো ভাটিতে 'জহুরা জাহের' করার জন্যই প্রেরণ করেছেন পৃথিবীতে; সে কথা ভাইকে স্মরণ করিয়ে দেন (মোটিফ: পি ২৫৩.৬ বোন ভাইকে স্মরণ করিয়ে দেয়)। অতঃপর শুরু হয় দ্বিতীয় খন্ডের কাহিনী। সেখানে আঠারো ভাটির বাদাবনে দক্ষিণরায় (মোটিফ - এ ১৩২.১০ ব্যাঘ্র দেবতা), ও তার মাতা নারায়ণীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন বনবিবি ও শাহ্‌জঙ্গলী। নারায়ণী সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বনবিবির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেন। বনবিবি আঠারো ভাটির মালিক হন। তৃতীয় খণ্ডের কাহিনীতে দেখা যায় ধনাই ও মনাই নামক দুই মৌলে ভাই (মোটিফ - পি ২৫১.৫ দুইভাই) বাধাবনে মধু সংগ্রহ করতে যাবে বলে বিধবা রমনীর সন্তান দুখেকে সঙ্গে নিল। কিন্তু বাধাবনে মধু সংগ্রহ করতে গেলে দক্ষিণরায়ের পুজো না দিয়ে সেখানে প্রবেশ করা নিষেধ। তারা এই নিষেধ ভঙ্গ করে দক্ষিণ রায়ের কোপে পড়লো (মোটিফ – সি ৯০০ নিষেধ ভঙ্গ করে শাস্তি)। দক্ষিণরায় দুখেকে নরবলি দিতে বললেন (মোটিফ: এস ২৬৯.১ মানুষ বলি)। অবশেষে দুখের কাতর আহ্বানে বনবিবি সেখানে এসে তাকে রক্ষা করলেন ও বড়খাঁ গাজীর মধ্যস্থতায় বনবিবি ও শাহ্‌জঙ্গলীর সঙ্গে দক্ষিণরায়ের চূড়ান্ত সমঝোতা সাধিত হল।

আমাদের আলোচ্য বনবিবির পালাটি থেকে প্রাপ্ত মোটিফগুলিকে মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী কেমনভাবে সাজিয়ে নেওয়া যায় তা নিচে দেখানো হল –

১. এ০ সৃষ্টি কর্তা
২. এ ১৩২.১০ ব্যাঘ্র দেবতা
৩. এ ১৬৫ ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত দূত
৪. এ ২৮৯.১ বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
৫. বি ২১১.২.২.১ কথাবলা বাঘ
৬. বি ৪৪৩.১ উপকারী হরিণ

৭. সি ৯০০ নিষেধ ভঙ্গ করে শাস্তি
৮. ডি ১৮৮০ অদৃশ্য হওয়া
৯. এম ৩১১.০.৩ ভবিষ্যৎবাণী : সন্তানের জন্ম হবে
১০. পি ২৫১.৫ দুইভাই
১১. পি ২৫৩ একভাই ও একবোন
১২. পি ২৫৩.৬ বোন ভাইকে স্মরণ করিয়ে দেয়
১৩. এস ২৬৯.১ মানুষ বলি
১৪. এস ৩৫২.১ পরিত্যক্ত শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করে পশু
১৫. এস ৩৫২.২ পরিত্যক্ত শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করে পাখি
১৬. জেড ৭১.০.২ সংকেত সংখ্যা ২
১৭. জেড ৭১.৫.০.১ সংকেত সংখ্যা ৭

পীর সাহিত্যের কেবলমাত্র একটি নিদর্শনকে সমীক্ষা করে প্রাপ্ত এই মোটিফের সংখ্যাই আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে এই বিষয়ে একটি সামগ্রিক গবেষণা অপেক্ষমান।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, আনন্দ (সম্পা.),'মুহম্মদ এনামুল হক বিরচিত বঙ্গে স্বূফী প্রভাব', কলা কেন্দ্র সংস্করণ, কলকাতা, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ২০১২, পৃ. ১৩৫।
২. সনৎকুমার নস্কর, 'মুঘল যুগের বাংলা সাহিত্য', রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ. ১২।
৩. তদেব, পৃ. ৮০।
৪. ভট্টাচার্য, আনন্দ (সম্পা.), তদেব গ্রন্থ, পৃ. ৬৫।
৫. নস্কর, সনৎকুমার, তদেব গ্রন্থ, পৃ. ৮১।
৬. Leach, Maria সম্পাদিত 'Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend' - গ্রন্থে Legend সম্পর্কে বলা হয়েছে,--

> Legend - originally, something to be read at religious service or at meals, usually a saint's or martyr's life-legend has since come to be used for a narrative supposedly best in fact, with an intermixture of traditional materials, told about a person, please, or incident. The line between myth and legend is often vague. The myth has as its principle actor the gods and as its purpose explanations…the legends is told as true the myth's veracity is best on the belief of its heaters in the gods who are its characters (**see** : Maria Leach(ed.), 'Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend'(vol. 1), New York, Funk and Wagnalls, 1950, pg 612).

৭. Thompson, Stith, 'The Folktale', New York, Berkeley, University of California Press, Reprinted, 1977, p. 8.
৮. দাস, গিরীন্দ্রনাথ, 'বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা', শেহিদ লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৬, পৃ. ১১।

৯. ইসলাম, সা'আদুল, 'বাংলার হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মিশ্রণ', সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ১৯৪।

১০. 'মোটিফ ইনডেক্স' – অ্যান্টি আর্‌নের 'টাইপ ইনডেক্স'-এর সম্প্রসারণ ঘটানোর সময় ১৯২৮ থমসন লোক কথার মত ইন্ডেক্সের তালিকাটি প্রস্তুত করতে শুরু করেছিলেন। অতঃপর ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর Motif Index Of Folk Literature প্রথম খন্ড। ১৯৫৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে যায় এই শিরোনামাঙ্কিত গ্রন্থমালার মোট ছ'টি খণ্ড। বিপুল অধ্যবসায়ে তিনি বিশ্বের নানা ভাষায় প্রচলিত বিশাল সংখ্যক লোককথার সমীক্ষা করে তৈরি করেন 'মোটিফ মোটিফ ইনডেক্স'। মোটিফের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেন-- A motif is the smallest element in the tale having a power to persist in tradition. In order to have this power it must have something unusual and striking about it. লোককথার প্রায় ২৫ হাজারের বেশি মোটিফের সন্ধান দেন। এছাড়াও এই ইনডেক্সের একটি অন্যতম দিক হল পরবর্তী গবেষণায় নতুন মোটিফের সন্ধান পাওয় গেলে, অতি সহজেই এখানে সেটিকে সংযুক্ত করা যায়। (দ্রষ্টব্য: Stith Thompson, The Folktale, p. 419)

১১। বনবিবির কাহিনীর জন্য দ্রষ্টব্য: বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, 'বাংলার লৌকিক দেবতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৫, পৃ.২৯-৩৪ এবং দাস, শশাঙ্কশেখর, 'বনবিবি', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৮।

১২। **মোটিফ ইনডেক্সের জন্য দ্রষ্টব্য**: মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, 'বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স' প্রথম গাঙচিল সংস্করণ, কলকাতা, গাঙচিল, ২০১২ এবং https://ia600301.us.archive.org/18/items/Thompson2016MotifIndex/Thompson_2016_Motif-Index.pdf